দশম অধ্যায়

ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ও ভাব

দশম অধ্যায়

ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ও ভাব

ভাষা হল ভাবের বাহন। ভাষা হল এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্যপ্রাণী থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মানুষের হৃদয়ের চিন্তা মূলতঃ আত্মার নিজের সঙ্গে নীরবে কথোপকথন। কিন্তু যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তার জগৎ থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তাই ভাষা। "মানুষের উচ্চারিত, সুনির্দিষ্ট অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।" (১) আবার মতিলাল বাণারসী দাস বলেছেন, **"A group of people whose the same system of speech signals is a speech community."**(২) সামাজিক স্তর ভেদে এবং ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ভাষার কিছু পৃথক রূপ গড়ে ওঠে, একে সামাজিক উপভাষা বলা হয়। তেমনি একই ভাষার মধ্যে অঞ্চলভেদে যে কিছুটা পৃথক রূপ দেখা যায় তাকে আঞ্চলিক উপভাষা বলা যায়। "পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষারই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য— আঞ্চ লিক উপভাষা। বাংলা ভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে।" (৩)

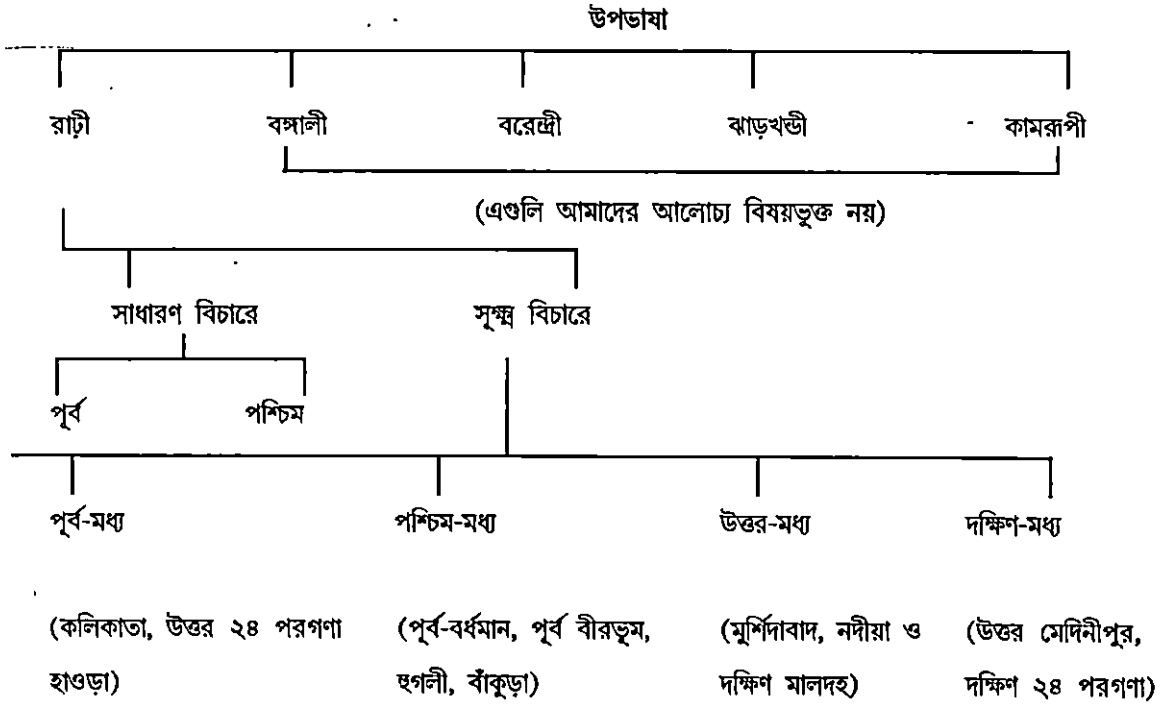

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বহু আঞ্চলিক ভাষা জায়গা করে নিয়েছে। রাঢ়-বংলার সেইরূপ এখানে দেখানো হল—

রাঢ়ীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্য ঃ রাঢ়ের ভাষায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। রাঢ়ের পরিধি যেমন ব্যাপক তেমনি শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও কলকারখানার সংখ্যাধিক্যের জন্যে জনঘনত্বও বহুল। সুতরাং তাদের লোকায়ত ভাষার মধ্যেও বিভিন্নতা প্রকট। বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বৈশিষ্ঠ্যগুলি দেখানো যেতে পারে। এই বৈশিষ্ঠ্যগুলি সবই বীরভূমে প্রযোজ্য। প্রথমত ঃ— এখানে অভিশ্রুতি/স্বরসঙ্গতি জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন রাখিয়া > রেখে, করিয়া > কোরে।

দ্বিতীয়ত ঃ — প্রায়শই 'অ' কারের 'ও' কারের উচ্চারণের প্রবণতা স্পষ্ট। যেমন অতুল > ওতুল, বন > বোন।

তৃতীয়ত ঃ- অনুনাসিক স্বরের বহুল প্রয়োগ রয়েছে।

যেমন- হইঁছে, খাইঁঞে।

চতুর্থত ঃ- 'ল' কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন লৌহ > নোয়া, লবন > নুন।

পঞ্চমত ঃ- শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত ঘটলে শব্দের অন্তেস্থিত ও মহাপ্রাণ ধ্বণি স্বল্পপ্রাণে উচ্চারিত হয়।

যেমন - দুধ > দুদ্, বাঘ > বাগ্।

ষষ্ঠত ঃ- কোন কোন অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। যেমন কাক > কাগ, ছত্র > ছাদ ।

সপ্তমত ঃ- কোন কোন অঞ্চলে বিষম স্বরধ্বনি সমস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি।

অষ্টমত ঃ- ক্রিয়ারূপে বিশেষত্ব রয়েছে। 'লুম' বা 'নু' বা 'লম' দিয়ে উত্তম পুরুষের পদ গঠন হয়েছে। যেমন— করলুম বা করনু বা করলম্। ক্রিয়াপদের শেষে 'লম' যুক্ত হয় নিম্নজ শ্রেণীর কথাতে। করলম্/দিলম ইত্যাদি (শিলাসন গল্প)।

"বীরভূমের ভাষার দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন পশ্চিম বীরভূমের ভাষা পশ্চিম রাঢ়ীর অন্তর্গত এবং পূর্বের ভাষা পূর্ব রাঢ়ীর। বিভিন্ন উপভাষার ও আঞ্চলিক ভাষা বা ঔপভাষিক ভাষার মিশ্রণে এখানকার ভাষার পরিধি ও গতি প্রকৃতি বিচিত্র, শ্রেণী বিচার অত্যন্ত দুরূহ। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল সাঁওতাল পরগণা, তাছাড়া বীরভূম বহুদিন মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল। ফলে উর্দু বা হিন্দী এবং সাঁওতালী ভাষার প্রভাব রয়েছে। বীরভূমের ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ও ওড়িয়ার মিল রয়েছে।" (৪)

তারাশঙ্করের ভাষাগত দক্ষতা বিস্ময়কর। সহজ সরলভাবে ভাষায় তিনি সঞ্চার করেছেন স্বীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীর পাত্র পাত্রীদের মুখের কথা এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে; যেন মনে হয় তারাশঙ্কর ঐসব অখ্যাত অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গী ছিলেন। চরিত্রপ্রধান গল্প লেখায় ঝোঁক তাঁর বেশী ছিল। ফলে চরিত্রের মুখের কথা হুবহু তিনি চয়ন করেছেন। এই সুযোগটাও তিনি ছোট বয়স থেকেই পেয়েছিলেন। মুখে মুখে গল্প বলার বৈঠকী-রীতি তাঁকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, " ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি , এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে; সেকালের গল্পগুলির মধ্যে অন্ততঃ আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।" (৫) বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে তিনি রাঢ়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরেছেন-মিশেছেন সেই সব ব্রাত্য অজ্ঞাতকুশীলদের সাথে। তাদের নিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন। অন্যান্য লেখকদের কাছে গল্প বলার আর্ট বস্তুটা মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। কিন্তু তারাশঙ্করের লেখনীতে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম চোখে পড়ে। আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায় সেইজন্যেই বোধ হয় বলেছেন, "চরিত্র ও চিত্রের সার্থক রূপায়ণ না ঘটলে প্রকৃত সাহিত্যের মর্মোদ্ধার হয় না। তারাশঙ্কর সেই বিরল জাতের লেখক, যাঁর রচনায় ভালোবাসার প্রকৃতি ছুঁয়ে উঠে এসেছে ভালোবাসার মানুষ।" (৬) নিতাই বসুও তাই বলেছেন, "রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে জান্তব স্থূলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ লেখক"। (৭) রাঢ়ের বিশেষকরে বীরভূমের সাধারণ মানুষের প্রাণ হলেন তারাশঙ্কর। "বিশেষভাবে যতদিন ময়ূরাক্ষী বীরভূমের প্রাণ প্রবাহিনী হয়ে থাকবে, ধর্ম ঠাকুর হয়ে থাকবেন অধিদেবতা এবং রাঢ় বাংলার সদ্গোপ, কৈবর্ত, কাহারেরা বেঁচে থাকবে, ততদিন তারাশঙ্করও বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।" (৮)

তারাশঙ্কর তাঁর দেখা মানুষ ও পরিবেশকে সরাসরি সাহিত্যে এনেছেন। যেমন 'কবি' গল্পের সতীশ, রাজন। "ডাইনী" গল্পের স্বর্ণ প্রভৃতি। পরিবেশ ও প্রতিবেশ— যেমন সুঁদীপুরের বটতলা, আখড়াইয়ের দীঘি, ফুল্লরাপীঠ, কংকালীতলা, ধনডাঙ্গা, গোগা, দাশকল প্রভৃতি বহুস্থান ও পরিবেশের চিত্র বহু গল্পে সন্নিবিষ্ট আছে। 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা, 'যাদুকরী' গল্পের যাদুকরীদল, 'কামধেনু' গল্পের নাথু পটুয়া বা গরুমারা এরা লেখকের দেখা চরিত্র। লাভপুরের শশী ডোমের চৌর্যবৃত্তি, শশাঙ্কবাবুর চায়ের দোকান বা অন্ধ পঙ্ক্ষী প্রভৃতিদের পেশা, কথা, গান, অঙ্গভঙ্গী সবই গল্পে বিধৃত করেছেন। বীরভূমে বহু সম্প্রদায়ের আনাগোনা ও বসতি। তাই এখানকার ভাষা কেবল রাঢ়ী নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহার প্রচলিত। পশ্চিম রাঢ়ের (বীরভূমের) মানুষের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর "দেবতার ব্যাধি" গল্পে বলেছেন, "পশ্চিমরাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, 'ড়' কারের ছড়াছড়ি। গিয়েছে, হয়েছে স্থলে গেইছে, হইছে; কেন কে বলে কেনে; খেয়েছিকে বলে খেঁয়েচি। হার কে বলে হাড়, রামকে বলে আম আর আমকে বলে ড়াম।"

বীরভূমের পাশেই হিন্দী ভাষা-ভাষী বিহার রাজ্য। বহু যুগ থেকেই ব্যবসাগত বা অন্যান্য কারণে দুই পারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে নিবিড় ভাবে। সুতরাং হিন্দী ও বিহারী ভাষার থেকে বহু শব্দ ও ধাতু সরাসরি বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বীরভূমে প্রচলিত হয়েছে। তারাশঙ্করের বহু গল্পে এর নিদর্শন মেলে। যেমন "কামধেনু" গল্পে নাথু জেলখানায় ফাঁসির

প্রাক-মুহূর্তে ওয়ার্ডারকে প্রশ্ন করে—" ওহি যে আঁতঠো, উঠো গরুকা হ্যায় না ?" আবার 'ইমারত' গল্পে জনাব বলেছে, "একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ্। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয়— পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভস্ম লিয়ে খা সি তখন ওষুধ। কাঁচা খা গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।" 'প্রত্যাবর্তন" গল্পে সদ্য বিদেশাগত পশুপতি তার সৎ বাবাকে বলেছে, "বুঢ্ঢা কাঁহা? শুয়ার কি বাচ্চা?" "গোস্ত রাধতে জানিস? মান্সো।" "যাদুকরী" গল্পে যাদুকরী মেয়েটি বলেছে, "শিব ঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—ললছা পারা বাবুটি।" "বুঝলা ঠাকরণ, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে?"

এছাড়া তারাশঙ্করের বহু গল্পে গা, গো, গে, প্রভৃতির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বীরভূমে আভিমুখ্য বোঝাতে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিহারী মৈথিলী ভাষার স্বার্থিক 'গ' প্রত্যয়। এখানকার মানুষ 'বাড়ী'কে ঘর বলে। যেমন তুর ঘর কুথা বটে? এখানে 'বাড়ি' কথাটি ক্ষেত বা খামার অর্থে প্রযুক্ত। কোন কোন জেলায় তা 'কামাত' নামে প্রচলিত। আবার পুত্র-কন্যাকে অনেকেই বেটা-বেটি বলে। 'ইমারত' 'যাদুকরী', 'প্রতীক্ষা' ইত্যাদি গল্পে এর প্রমাণ মেলে।

বীরভূমের ভাষায় অতিহ্রস্ব 'ই' ধ্বনির আগমে সাঁওতালী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট। আবার 'ন' কারের স্থলে 'ল'কারের প্রয়োগ। যেমন- 'শিলাসন' গল্পে কাঁদন বলে, "আমি দেখাব, সি লোকটার লহু আমি দেখব, রক্ত লিব, দেখাব - পাথর কালো হল না, কিছু হল না।" আবার ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত ব্যবহার। যেমন- 'তমসা' গল্পে পঙ্খী বলে, "আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে।" এখানে 'লাগছে' কথাটি জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত। ক্রিয়াপদের বিকৃতি - রেঁধে > এঁদেও (বরম লাগের মাঠ) পুড়ে > পুড়্যা (বেদেনী), গোঙারছে (আখড়াইয়ের দীঘি), নারি > লারি (একপশলা বৃষ্টি) পেলাম>পেলম (বেদেনী)।

বাক্যরীতির বিশিষ্টতা ঃ- "আমার আস্পদ্দা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে" (তমসা)। "ওরে বাপ্‌রে, ওটা ফুটায়েন না।" "আপনাদের চি-চরণের দাস" (বরমলাগের মাঠ)।

"সর্বনামের বিকৃতি ঃ- ই < এই, যি < যে, উ < ও, ইখন < এখন, ইথে < এতে। বিশেষ্য ও বিশেষণের বিকৃতি আমানুষী < অমানুষী, পচি < পশ্চিম, সিনুর < সিন্দুর, টুকচা < একটু, এত্যানি < এতখানি।" [১]

ধ্বনির পরিবর্তন ঃ- (১) বিষমীভবন— শরীর < শরীল (ইমারত), পৃথিবী < পৃথিমী (পাটনী)।

(২) ব্যঞ্জনের আগম - ওঝা > রোজা (সাপুড়ের গল্প), অজ > রজ (আওয়াজ) (তমসা), অন্ন > রন্ন (বরমলাগের মাঠ), মূর্খ > মুরুক্ষু (যাদুকরের মৃত্যু)।

(৩) তালবীভবন - সন্ধ্যা > সন্‌জা (ডাকহরকরা), সম্মুখে > ছামনে (তমসা)।

(৪) অনিয়মিত পরিবর্তন :- অক্ষম > অকখ্যাম (ইমারত), এই শব্দটি থেকেই উত্তরবঙ্গে ক্ষতস্থান বা অচল বোঝাতে 'খাম' শব্দটি ব্যবহার করে। কেন > ক্যান্যা (বেদেনী) ।

(৫) অন্ত্যস্বর লোপ :- সঙ্গ > সঙ্ (মতিলাল), প্রতিবেশী বিহারী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

(৬) 'ন'কারের 'ল'কারে রূপান্তর :- বড়নথ > ফাঁদিলত, নষ্ট > লষ্ট, নদী > লদী(তারিণী মাঝি), এই গল্পে 'আমানি' শব্দটি আছে। রাঢ় বাংলায় রান্নাকরা গরম ভাতের অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া হয় তাকে বলে ফ্যান, অন্যত্র মাড় বলে। আবার বাসী শুকনো ভাতে জল মিশিয়ে রাতে রেখে পরদিন সকালে তা পান্তা ভাত হয়। ভাতের সঙ্গে মিশ্রিত জল 'আমানি', নামে পরিচিত। এই জল ভাতের সঙ্গে খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে, গ্রীষ্মকালে রাঢ় বাংলার দরিদ্র সংসারে প্রায়ই দেখা যায়। নীল > লীল (তারিণী মাঝি), আপনার > আমনার (প্রতীক্ষা)।

(৭) ই-ধ্বনি উ বা এ হয়েছে- টাইম > টায়েন (ডাকহরকরা) জীবন >জেবন (বরমলাগের মাঠ)।

(৮) পসুক্রিয়া 'বটে' এর ব্যবহার প্রচুর যেমন- ভারী মিঠা বটে, লয় তো কুঁড়ে বটে, ইত্যাদি (একটি প্রেমের গল্প) ভাই বটে, (কমলমাঝির গল্প)।

(৯) 'পারা' প্রত্যয়টি বহুল ব্যবহার। যেমন— কালোপারা, ললছে পারা (যাদুকরী ইত্যাদি)।

(১০) বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে প্রথমপুরুষের সকর্মক পদে 'স্বার্থিক ক' প্রযুক্ত হয়। যেমন—সিখান থেকে বটেক (একটি প্রেমের গল্প)।

"আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যবহার তাঁর গল্পকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। যেমন

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জাত বৈষ্ণব ও ভেকধারী, ছাড়পত্র প্রথা(রসকলি), ঘাঁটি খেলা (আখড়াইয়ের দীঘি), সূতিকা গৃহের দুয়ারে রাতে রাখা প্রহরা (অগ্রদানী), পৌষ আগলানো (পৌষলক্ষ্মী), রাঢ়দেশে বৈশাখী পূর্ণিমায় নিম্নজাতির মধ্যে ধর্মপূজা উপলক্ষে মুক্তিস্নান (মতিলাল), অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সাঙা প্রথা (স্থলপদ্ম), ভাঁজোগান(বাবুরামের বাবুয়া), সুরভিমঙ্গলের গান (কামধেনু) ইত্যাদি।" [১০]

"বাউরী সম্প্রদায় ভাঁজোপরব বা সূর্যদেবের উপাসনা করে— দিনরাত সুরার স্রোতে ভেসে থাকে' (প্রতীক্ষা)। এখনকার গ্রামের অশিক্ষিতরা স্ত্রীকে তুচ্ছার্থে 'মাগী' বলে।

বীরভূমে প্রচলিত শব্দের মধ্যে 'সিজুনি' হল এমন একটি শব্দ যার অর্থ কাপড়ের তৈরী নক্সা আঁকা কাথা। সুতো দিয়ে বিভিন্ন চারুশিল্প এতে সৃষ্টি করা হয়। অতিথি এলে বিছানার উপর এটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। 'রসকলি' গল্পে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। আবার কুটিল হাসিকে এখানকার লোক বলে 'মসনে ফুলী',—"প্রসাদমালা" গল্পে এই শব্দটি আছে। গাছের সবচেয়ে উঁচু শাখাটাকে শিরডাল বলে। আবার অন্ত্যজ শ্রেণী শিরডালকে 'শিরডগাল' বলে (বেদের মেয়ে), খ্রীষ্টান শব্দটিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলে, "কেরেস্তান" (বাবুরামের বাবুয়া)। 'কিন্তু' শব্দটিকে "কিন্তুক" বলে বহুল ব্যবহৃত। অন্ধকার > অন্নকার (সনাতন)। এই শব্দটি মালদহের পশ্চিমপ্রান্তে অন্ত্যজগণ 'আনার' ব্যবহার করে। 'সুরতহাল রিপোর্ট' গল্পে পরী বাউরী চিরজীবন কে বলেছে "ছেরো জেবন"। আবার পাঁট শব্দটি (জুয়াড়ী) এসেছে পাঁইট- শব্দ থেকে। রাঢ় বাংলায় অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে মদের অর্ধেক বোতলকে পাইট বা পাঁট বলে।

তারাশঙ্কর কেবল শব্দের বা উপভাষার ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সঙ্গে তিনি গল্পে অসংখ্য প্রবচন ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন যেগুলি রাঢ়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ। যেমন—

(১) মিসে নেয় না পায়ের কাছে/মাগী বলে আমার সোহাগ আছে, (স্রোতের কুটো), ভাতদেবার সোয়ামী নয়কো, ঠেঙা মারবার গোঁসাই (স্রোতের কুটো), যেমন দেবা/তেমনি দেবী (রসকলি), আপন তেতো পর মিষ্টি/ছেনালের এই কুষ্টি (স্থলপদ্ম), ভাতদেবার সোয়ামী নয়কো/ কিল মারবার গোঁসাই (শ্মশানের পথে), বাহাদুর পুরের লাঠি/কুলির ঘাঁটি (আখড়াইয়ের দীঘি), লাজেমা কুঁকড়ি/ বেপদের ধুকুড়ি (তারিণী মাঝি), পরের মাথায় দিয়ে হাত/ কিরে (শপথ) করে নির্ঘাত (সুরতহাল রিপোর্ট), বাপকো বেটা সিপাহীকা ঘোড়া (জুয়াড়ী), সোনা বাইরে আঁচলে গিঁঠ/দেবতা ফেলে হনুর খাতির (জুয়াড়ী), 'ঘোড়া দিলেন তো চাবুক দ্যান' (তমসা) সোম-শুক্রে পরে শাড়ি/ ধন হয় তার আড়ি আড়ি, চৈতেবুয়া, ভাদরে বান/নরমুন্ড গড়াগড়ি যান(পৌষলক্ষ্মী), বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো (বিষ পাথর), "তুমিই বুঝি তুলসী বোষ্টমী/গাইয়ে বাজিয়ে, বলিয়ে-কইয়ে, রূপে মরি মরি, (মালাচন্দন), কারও মাথায় সোনার ছাতা/কারও ফাটে ব্রহ্মতালু (বাউল), টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না / টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে (শ্মশান বৈরাগ্য), তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দেব সই। গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কীমালা বই (প্রতীক্ষা), নাইধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে /আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির ফাটছে, (সন্ধ্যামণি) চাষার বুদ্ধির ধার কেমন/না ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন (রাইকমল), রাঙা পেড়ে শাড়ী দিব শঙ্খ দিব রাঙা/সুন্দরী লো কর্ না থানায় তিন নম্বর সাঙা (স্থলপদ্ম), অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে (রসকলি) ইত্যাদি।

তাঁর গল্পে গানের ব্যবহারও অসংখ্য। যেমন— "ও আমার ঘেটুনির মন হলো ভারী/ লতুন কাপড় লইলে যাবে না শ্বশুর বাড়ি (ইস্কাপণ), হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো, লোক মরিছে অসম্ভব (ডাকহরকরা) হল শূল, সখি পীরিতি হল শূল (প্রতীক্ষা), ভাল করে পড়গা ইস্কুলে/নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে (বাউল), ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী/আর কি তোর মনে আছে এলোকেশী (সর্বনাশী এলোকেশী), সখি বলিতে বিদরে হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া, এভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর (মালাচন্দন), বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে/দেখা না হইত পরাণ গেলে (প্রসাদমালা), কালা বিনে হলাম কাল/কলোর গুণ আর বলব কত (স্থলপদ্ম), পাঁচসিকের বোষ্টুমি তোমার/ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে (রসকলি), বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে/ দেখা-ত হত না পরাণ গেলে (উল্কা), কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি, চোখে ছটা লাগিল/ তোমার আয়না বসা চুড়িতে" (তমসা), বাবুদের চিলে কোঠার ছাদে। চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে (ইমারত), ইত্যাদি।

এমনিভাবে সব গান তিনি গল্পে এনেছেন— যে গানগুলোর বেশীরভাগই লোক-ব্যবহার ও কিছু কিছু বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা আঞ্চলিকতারই জলছাপ।

পাদটীকা

১।	ভাষার ইতিবৃত্ত	:	ডঃ সুকুমার সেন	পৃ. ১
২।	Bloomfield Leonard	:	Language (Delhi) Monilal Banarsidass	P-29
৩।	সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা	:	ডঃ রামেশ্বর শ	পৃ. ৬৫১
৪।	বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ	:	ডঃ সত্যনারায়ণ দাস	পৃ. ২
৫।	রচনাবলী (১০ম খন্ড) দে'জ সং	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩৯২
৬।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ১১০
৭।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	:	ডঃ নিতাই বসু	পৃ. ১৫৪
৮।	তারাশঙ্কর : দেশ কাল-সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত)	পৃ. ৩৬
৯।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৬
১০।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৭

* * * * * * * * * *